প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিভাজনের উর্ধে

ইব্রাহিম কালিন

মক্কায় যখন মুসলিমদেরকে প্রথম নামাজের আদেশ দেওয়া হয়, তারা পূর্ব দিকে জেরুজালেমের দিকে ফিরেই নামাজ আদায় করেছিল। ৬২২ হিজরীতে মুহাম্মদ (সা) মদীনায় হিজরত করার পর প্রায় দেড় বছর ধরে এভাবেই চলে আসছিল। পরে তাদেরকে মক্কায় কা'বার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতে আদেশ দেওয়া হয়। আজও তারা সেদিকে ফিরেই নামাজ আদায় করছে। নামাজের এই দিকবদল নিয়ে লোকেরা যখন প্রশ্ন করেছিল, আল্লাহ তখন কুর'আনে তাদের উত্তর দিয়েছেন এই বলে যে, "পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহরই। যেদিকেই ফেরো, সেদিকেই তোমরা আল্লাহকে খুঁজে পাবে। আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ (সূরা বাকারা, ২:১১৫)।" সপ্তম শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে আজকের মতো "প্রাচ্য" এবং "পাশ্চাত্য" বলতে আমরা যা বুঝি তা বুঝানো হত না। ইসলামের অনুসারীদের জন্য কা'বা পূর্বদিকে অবস্থিত না। মুসলিম ও ইহুদিদের জন্য জেরুজালেমের ব্যাপারেও একই কথা খাটে। কোনো ভৌগলিক সীমারেখা দিয়ে এসব পবিত্র জায়গাগুলোকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। পূর্ব-পশ্চিমের উর্ধে এগুলো মানুষের জন্য নামাজ ও বরকতের কেন্দ্রবিন্দু।

আধুনিকতার উত্থানের পূর্বে, ইসলামের সার্বজনীন ভাষা পৃথিবীকে বোঝার জন্য প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য এরকম কোন সাংস্কৃতিক বিভাজন তৈরী করেনি। পূর্ব-পশ্চিম সবই আল্লাহর। এর মানে একটাই: বাস্তবতার এমন এক পর্যায় আছে, যা পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণকে ছাড়িয়ে যায়। জ্ঞানের সন্ধানে মুসলিম 'আলেম, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা সারা পৃথিবী চষে বেরিয়েছেন। জ্ঞান নিয়েছেন গ্রিক, ভারতীয়, চাইনিজ, আফ্রিকান, সাসানিদ, ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে। প্রাচীন লোকবিদ্যাগুলো ছেঁকে যেগুলোকে তারা প্রয়োজনীয় ও উপকারী মনে করেছেন সেখান থেকে সেগুলো নিয়েছেন। ধর্ম, বর্ণ বা ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে গৎবাঁধা সরলীকরণ, বৈষম্য বা হেয় করার প্রবণতা ছিল না।

আল-কিন্দিকে বিবেচনা করা হয় প্রথম মুসলিম দার্শনিক হিসেবে। জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন এই বলে যে, "[আমি তাঁদের সবার কাছে ঋণী,] যারা আমার পূর্বে এসেছেন এবং মানবকল্যাণের জন্য জ্ঞান রেখে গেছেন।" পরবর্তী চিন্তাবিদেরা প্রাচীন গ্রিক ও গ্রিক দর্শন, চাইনিজ জ্ঞানসাধক এবং ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাজের উপর ক্রিটিকাল পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু এগুলোকে "প্রাচ্যের" বা "পাশ্চাত্যের" এভাবে অভিহিত করেননি। তাদের নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় পরিচয়কে অগ্রাহ্য করে, তাঁরা এই সকল জ্ঞানী ব্যক্তিদের সৃষ্টিকর্মের উপকারী দিকগুলোর উপর নজর দিয়েছেন। বর্তমানে মুসলিমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে ফেলেছে এবং বাইনারি চিন্তার ফাঁদে পা দিয়েছে। প্রাচ্যের প্রশংসা কিংবা পাশ্চাত্যের নিন্দায় তারা হারিয়ে বসেছে কোনো সিরিয়াস বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থেকে। বাইনারি চিন্তা আমাদের অন্তরকে ঢেকে রাখে এবং সৃষ্টি করে বিভ্রান্তি, দূরত্ব আর অজ্ঞতা।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, উপরে আমরা যে আয়াতটি উদ্ধৃত করেছি তা মধ্যযুগে এবং এর পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ইউরোপীয় চিন্তাবিদদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জার্মান কবি গ্যোথে পূর্ব-পশ্চিমের বিভাজন কাটিয়ে উঠার জন্য উপরের আয়াতটি উল্লেখ করেন এবং তাঁর একটি কবিতার বইয়ের নামকরণ করেছেন "West-östlicher Diwan" বা পূর্ব-পশ্চিম দিওয়ান। ১৮ শতকের একজন বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদ জোসেফ হামার-পার্গস্টল (Joseph Hummer-Purgstall)-এর মনে এই আয়াতের ভাবার্থ এতটাই ছাপ ফেলেছিল যে, তিনি তাঁর বিভিন্ন কর্মে এর উদ্ধৃতি দিতেন। তবে তিনি একটা বেশ নাটকীয় কাজও করেছেন। তাঁর সমাধিপ্রস্তরে এ আয়াতটি খোদাই করে রেখে দিয়েছেন।

ট্র্যাডিশনাল মুসলিম স্কলারদের প্রাচ্যদেশীয় হিসেবে অভিহিত করাটা একটু অদ্ভূত ঠেকবে। বর্তমানে যাকে মধ্যপ্রাচ্য বলা হয়, ইবনে সিনা সেখানকার বাসিন্দা ছিলেন বলে তিনি যেমন প্রাচ্যের দার্শনিক হয়ে যাননি; তেমনি ইবনে রুশদ আন্দালুসিয়ায়-বর্তমানে যার নাম স্পেন-সেখানে ছিলেন বলে তিনি পশ্চিমা দার্শনিক হয়ে যাননি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এসব আধুনিক ক্যাটাগরি। ১৮ শতক থেকে এগুলো মুসলিম এবং নন-মুসলিমদের চিন্তাভাবনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। গুচ্ছ গুচ্ছ সমজাতীয় বিশ্বাস, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিসহ এগুলো পরিণত হয়েছে এমন ক্যাটাগরিতে যার ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। এগুলো থেকে পারস্পরিক বোঝাপড়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিমদের এ থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। রাজনৈতিক অবিচার, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ অথবা অর্থনৈতিক শোষণ মোকাবিলায় তাদেরকে দায়িত্ব-জ্ঞানহীন সরলীকরণ ও অগভীর শ্রেণিবদ্ধকরণ এড়াতে হবে। সুবিচার, সমতা ও মর্যদার জন্য অধিকারচ্যুত ও বঞ্চিত বোধগুলোকে গঠনমূলক ডিসকোর্সের দিকে ধাবিত করতে হবে। “আমরা বনাম ওরা” এ ধরনের অবস্থান ক্ষতিকর। সেটা আমেরিকা, ইউরোপ বা মুসলিম যাদের থেকেই আসুক।

> মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে “পাশ্চাত্যবাদ”-এর (Occidentalism) ফাঁদে না পড়ে ইউরো-কেন্দ্রিকতা থেকে বেরিয়ে আসা। এর মানে হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা হাজির করতে হবে কিন্তু তাই বলে নিজের দুর্বলতাকে ঢেকে রাখা যাবে না। অর্থাৎ অন্যকে দোষারোপ করার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং আত্ম-সমালোচনাকে ভয় করলে চলবে না। ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক সময়ে যারা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শ্রেণীকরণকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, তাদের মধ্যে যে গুটিকয়েক মুসলিম ইনটেলেকচুয়াল ছিলেন প্রয়াত আলিয়া ইজ্জেতবেগোভিচ (Alija Izzetbegovic) তাদের অন্যতম। তাঁর বই “ইসলাম বিটউইন ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট”-এ প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য কাউকে হেয় প্রতিপন্ন না করে এসবের উর্ধে ইসলামকে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

অনেক মুসলিম ‘আলিম ও চিন্তাবিদেরাও এ ধরনের কাজ করেছেন। সায়্যিদ হুসাইন নাসের, তারিক রমাদান, হামযা ইউসুফ, টিমোথি উইন্টার (আবদুল হাকিম মুরাদ), সায়্যিদ নাকিব আল-আত্তাস, খালিদ আবু আল-ফাদল, ইংরিদ ম্যাটসন এবং এরকম আর অগণতি বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আছেন যারা কোনো ধরনের ভ্রান্তি সৃষ্টি ছাড়াই ইসলামি শাস্ত্র ও আধুনিক বিশ্বের উপর ক্রিটিকালি পড়াশোনায় নিমগ্ন। প্রচারমাধ্যম যেখানে আইএসআইএসের হত্যাযজ্ঞের বিজ্ঞাপন নিয়ে ব্যস্ত, এই স্কলাররা তখন প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করে মধ্যপন্থা অক্ষুণ্ণ রাখছেন। কারণ, তাঁরা ভাবেন পূর্ব-পশ্চিম সবই আল্লাহর।

মুসলিম সমাজগুলোকে ভীতসন্ত্রস্ত মনোভাব এবং নিজেদেরকে সবসময় বলির পাঠা ভাবা-এ ধরনের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে যা বর্তমান বিশ্ব ও এখানে তাদের অবস্থান নিয়ে তাদের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করছে। চরম জুলুম আর অবিচারের সম্মুখীন হয়েও জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ধৈর্য ও নৈতিকতার উপর নিজেদের ভিত্তি নির্মাণ করা উচিত। অন্য কাউকে প্রশ্নবিদ্ধ করার পূর্বে মুসলিমদের উচিত প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিভাজন থেকে সরে আসা। কেননা, এটা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক অলসতা ও নৈতিক দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই দেয়নি।

সূত্রঃ Daily Sabah

ইব্রাহিম কালিন

ড. ইব্রাহিম কালিন বর্তমান যুগের অনন্য মুসলিম চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। তাঁর জন্ম সাবেক উসমানিয়া খেলাফতের প্রাণকেন্দ্র তুরস্কে। তিনি দর্শন শাস্ত্রে পড়াশোনা করেন। তিনি তাঁর পিএইচডি ডিগ্রিও নেন দর্শন শাস্ত্রে। তাঁর ‘ পিএইচডি’ র সন্দর্ভের শিরোনাম ছিল “Knowledge as Appropriation: Sadr al-Din al-Shirazi (Mulla Sadra) on the Unification of the Intellect and the Intelligible” । তাঁর পিএইচডি অ্যাডভাইসরি বোর্ডে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিকদের অন্যতম ড. সাইয়্যেদ হোসাইন নাসেরও ছিলেন। ডঃ ইব্রাহিম কালিন বর্তমানে তুরস্কের প্রেসিডেন্টের বিশেষ উপদেষ্টা। এর আগে তিনি প্রধানমন্ত্রীর উপ-নিম্নসচিব, প্রধানমন্ত্রীর সিনিয়র উপদেষ্টা ও সরকারী কূটনীতির পরিচালক ছিলেন। তিনি জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের “প্রিন্স আল-ওয়ালিদ সেন্টার ফর মুসলিম-খ্রিস্টিয়ান আন্ডারস্টান্ডিং” এর একজন সম্মানিত ফেলো।
শিক্ষকতা জীবনে তিনি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর সুযোগ পেয়েছেন। ২০০১ সালে জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২ সালে মেরি ওয়াশিংটন কলেজে, ২০০২ সাল থেকে ২০০৪ পর্যন্ত কলেজ অফ দ্যা হলি ক্রোসে শিক্ষকতা করান। তিনি ২০০৫ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত “SETA Foundation for Political, Economic and Social Research”, (আঙ্কারা)-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। এছাড়াও তিনি ২০০৮ সালে জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে, ২০১০ সালে বিলকেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, আঙ্কারায় এবং ২০১১ সালে টোব্ব (TOBB) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এসময়ে তিনি যেসব বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলো হলোঃ ইসলাম পরিচিতি, কোর' আন পরিচিতি, ইসলাম ও পশ্চিমা বিশ্ব, ইউরোপ ও মধ্যপ্রচ্য, ইসলামী দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব, সুফিবাদ, ইসলাম ও আধুনিক বিশ্ব, তুরস্কে ধর্ম ও রাজনীতি এবং বিশ্ব-রাজনীতিতে তুরস্ক।
তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ হলোঃ 1. Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science and Technology, Editor-in-Chief; associate editors Salim Ayduz and Caner Dagli, Oxford University Press, 2 Vols. (forthcoming 2014). 2. Mulla Sadra, Oxford University Press (2013). 3. Metaphysical Penetrations, Mulla Sadra, translated by S. Hossein Nasr, edited with notes and introduction by Ibrahim Kalin, Brigham Young University Press, (2013). 4. War and Peace in Islam: The Uses and Abuses of Jihad, edited together with M. Ghazi bin Muhammad and M. Hashim Kamali (Cambridge: The Islamic Texts Society, 2013). 5. Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the 21st Century, co-ed. with John Esposito (New York: Oxford University Press, 2011) 6. (ed.) 2000' li Yıllarda Türk Dış Politikası (“Turkish Foreign Policy in the 2000s) (Meydan Yayinlari, İstanbul, 2011). 7. Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra On Existence, Intellect and Intuition, তিনি এছাড়াও অনেক বইয়ের রিভিউ লিখেছেন, লিখেছেন অনেক গবেষণা প্রবন্ধ। বর্তমানে তিনি Daily Sabah পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লেখেন। তাঁর ভাষাদক্ষতার আওতায় আছে আরবি, ফারসি, তুর্কি ও উসমানী তুর্কি। এছাড়াও তিনি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন।